অনীক

স্টেশনের নাম মাওবাদ

সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক মাওবাদী আক্রমণের ঘটনাগুলো আমাকে প্রায় তিরিশ বছর আগের একটা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আশির দশকের প্রথম দিক। কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে সাংবাদিকতার কাজে চম্বল এলাকায় যাচ্ছি। জঙ্গলে ডাকাতদের এলাকায় ঘুরছি। সেখানে দেখলাম গ্রামের গরিব মানুষ তাদের বাগি বা বিদ্রোহী বলে বেশ সম্মান করে। ভয়ও পায়, আবার উঁচু জাতের অত্যাচারী জমিদার আর শোষক পুলিশের কাছ থেকে বাঁচানোর জন্য, গ্রামের ঝগড়াবিবাদের মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য, বিপদের সময় টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করার জন্য ও এরকম সব রবিন হুড মার্কা কাজকর্মের জন্য তাদের শ্রদ্ধাও করে। একদিন বিকেলে আমরা বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, গ্রামের চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে গল্প করছি। একজন কৃষক কী করে চম্বলের মতো এলাকায় ডাকাত হয়ে ওঠে, আর অন্ধ্র বা বিহারে হয়ে ওঠে নকশাল গেরিলা (ঐ রাজ্য দুটি তখন মাওবাদী আন্দোলনের প্রধান এলাকা)—তা নিয়ে আলোচনা করছি। আলোচনায় বার বার মাওবাদ প্রসঙ্গ উঠছে। আমাদের পাশে চারপাইতে বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ, তিনি হঠাৎ আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ''ভাইয়া, ইয়ে মাওবাদ স্টেশন কাঁহা হ্যায়?'' তিনি জানালেন, ''এলাহাবাদ, মোরাদাবাদ, ফৈজাবাদ, ধানবাদ... শুনেছি, কিন্তু মাওবাদ স্টেশনের নাম তো আগে শুনি নি। কোথায় সে স্টেশনটা?''

তখন থেকে এ প্রশ্নটা আমাকে তাড়িত করছে। বর্তমানের সিপিআই(মাওবাদী) কি ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব একটি স্টেশন তৈরি করতে পারবে? এর থেকে আবার অন্য প্রশ্নও উঠে আসে। মাওবাদী আলোচনায় বারবার ট্রেন যাত্রা আর স্টেশনের তুলনা দেওয়া হয়। ১৯৭০-এর দশকে আমি যখন এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম তখন আমাকে বলা হয়েছিল, এটা একটা লম্বা যাত্রা। খুব কম বিপ্লবীই এই দীর্ঘ যাত্রার পুরোটা থাকতে পারবে। এই স্টেশনে যারা বিপ্লবের ট্রেনে উঠল, তাদের অনেকেই মাঝের স্টেশনগুলোতে নেমে যাবে, কিন্তু মাঝের স্টেশনগুলো থেকে নতুন অনেকে আবার ট্রেনে উঠবে। এভাবে চলতে চলতে ট্রেন অন্তিম স্টেশনে পৌঁছাবে। সেই যাত্রায় মাঝের এক স্টেশনে আমি ট্রেন থেকে নেমে গেছি (১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসানের পর), যে স্টেশনে পৌঁছানোর জন্য যাত্রা, সেই অন্তিম স্টেশনে মানবতাবাদী মূল্যবোধ আর গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সুরক্ষিত থাকবে কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণে। কিন্তু মাওবাদী ট্রেনটা চলতেই থেকেছে। নতুন নতুন যাত্রী উঠেছে তাতে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমার পুরনো সহযাত্রীদের কী হলো। কতজন হারিয়ে গেল — পুলিশের হাতে মিথ্যা এনকাউন্টারে মৃত্যু হলো কতজনের, কতজন বছরের পর বছর জেলে পচছে, কতজন আত্মসমর্পণ করলো? যারা সেই যাত্রা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে— দান্তেওয়াড়া, লালগড় ও ঝাড়খন্ডে, তারাই বা কেমন আছে? অরুন্ধতী রায়, গৌতম নওলাখা, জন মিরডাল, অল্পা শাহ ও তাহেলকার সাংবাদিকদের মতো যারা মাওবাদী 'গেরিলা এলাকায়' গেছেন তারা নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে মাওবাদী-দের চলমান সংগ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন, বর্ণনা করেছেন কেমন করে এই যুদ্ধের মধ্যে যেখানেই পা রাখার জমি পেয়েছেন সেখানেই তারা সাম্যভিত্তিক সমাজের ছোট ছোট দ্বীপ গড়ছেন।

এই যাত্রার মধ্যে মাওবাদীরা মুখোমুখি হয়েছেন রাষ্ট্রের সুরক্ষা বাহিনীর। তারা সিআরপিএফ-এর ওপর হামলা চালিয়েছেন, সশস্ত্র বাহিনীর গাড়ি বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছেন। সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের (যাদের অনেকেই গরিব পরিবারের সন্তান) মৃত্যু ঘটানোর বিষয়টি সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন অংশের নিন্দা কুড়িয়েছে। কিন্তু সিভিল সোসাইটির এই অবস্থানের সঙ্গে আমি একমত নই। ছত্তিশগড়ের জনগণের ওপর নিপীড়ক রাষ্ট্র যে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে তার কামানের খাদ্যদের শহিদ বানানোটা কি ঠিক?কাশ্মীর ও মণিপুর থেকে শুরু করে অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবাংলায় এদের হাতে মানবাধিকার হরণের কথা কি আমরা ভুলে যাব? তাহলে কি আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত নাজি সৈন্যদের মৃত্যুর জন্যও শোক করব? তাদের মৃত্যুর জন্য কি আমরা মিত্রবাহিনীকে অভিযুক্ত করব? যে মার্কিন সৈন্যরা তাদের গ্রাম ধ্বংস করেছে, নাপাম বোমা ফেলে মানুষজনকে পঙ্গু করে দিয়েছে, সেই মার্কিন সৈন্যদের মারার জন্য কি আমরা ভিয়েতনামের স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের নিন্দা করব?

ভারতের কোনও কোনও এলাকায় আজ যা ঘটছে তা গৃহযুদ্ধের মতো এক অবস্থা। রাষ্ট্র তার নিজের জনগণের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকেও দমনের জন্য আধা-সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে। সেই জনগণের এক অংশ রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। তাই এখন যুদ্ধ চলছে— রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে তার বিরোধীদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ চলছে মালকানগিরিতে, দান্তেওয়াড়ায়, ঝাড়খন্ডে, লালগড়ে। এই গৃহযুদ্ধে যোদ্ধারা (মাওবাদী যোদ্ধাই হন আর রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর যোদ্ধাই হন) তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৃত্যুর আশংকা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু অ-যোদ্ধা সাধারণ নাগরিকরাও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে বিপদে পড়ছেন, জেলে যাচ্ছেন, নিহত হচ্ছেন।

আর এখানেই গরিবের বন্ধু ও মানবিকতায় বিশ্বাসী বলে দাবি করেন যে মাওবাদীরা, তাঁদের রাষ্ট্রের খুনে সশস্ত্র বাহিনীর থেকে নিজেদের অন্যরকম প্রমাণ করার দায় থেকে যায়। অ-যোদ্ধা মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারে তাঁরাও কি সিআরপিএফ বা বিএসএফ-এর মতোই নিষ্ঠুর ও কান্ডজ্ঞানবর্জিত হবেন, অতীতের বিভিন্ন ঘটনায় যেমন দেখা গেছে (যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশে কাকতীয়া এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণের ঘটনায়, মাওবাদী নেতারা এখন যেটিকে তাঁদের নামে একটি 'কালিমা' বলে বর্ণনা করেন; কিংবা কয়েক বছর আগে হাওড়া-দিল্লী রাজধানী এক্সপ্রেসে সাবোতাজের ঘটনা; কিংবা সম্প্রতিকালে ছত্তিশগড়ে একটি বাসে ১৫ জন নিরীহ আদিবাসী নিধনের ঘটনা— এটিকেও মাওবাদী নেতারা তাঁদের 'ভুল' বলে বর্ণনা করেছেন; আর এ সবের ওপরে আছে অতি সম্প্রতি জ্ঞানেশ্বরী ট্রেন বিপর্যয়। মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র আজাদ যদিও এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর পার্টি জড়িত নয় বলে ঘোষণা করেছেন (*ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি* পত্রিকায় লেখা চিঠি, ১২ জুন, ২০১০), এই ঘটনায় তাঁদের কর্মী/সমর্থকদের দায় নিয়ে যে সন্দেহ ছিল, বাপি মাহাতোর গ্রেপ্তার ও গ্রেপ্তারের আগে ৩১ মে তারিখে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার কাছে এক সাক্ষাৎকারে তার এই ঘটনার দায় স্বীকারের ফলে এই ঘটনায় মাওবাদীদের যোগ থাকার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে।

হিংসার ব্যবহার

এসব থেকে মাওবাদীদের হিংসার ব্যবহার নিয়ে সাম্প্রতিক বাদবিসংবাদকে অতিক্রম করে একটা মৌলিক প্রশ্নে পৌঁছে যাই আমি। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের এলাকা কমে আসার প্রশ্ন। আমাদের উদারনৈতিক বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা যদিও দাবি করেন যে ভারতীয় গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের যথেষ্ট সুযোগ আছে, কিন্তু ঘটনা এই যে এইসব শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে দমন করার জন্য রাষ্ট্র প্রথমেই হিংসার পথ নেয়। শুধু বর্তমান ভারতের ক্ষেত্রেই যে এ কথা প্রযোজ্য তা নয়, সারা বিশ্বে ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ইতিহাস জুড়ে দেখা যায় এই ঘটনা। সারা বিশ্বেই দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য বিভিন্ন ধরনের

অহিংস পথে (যেমন, বয়কট, কর বয়কট, শিল্প ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, পরোক্ষ প্রতিরোধ ইত্যাদি) প্রতিরোধ প্রচেষ্টার লম্বা ইতিহাস আছে। কিন্তু পুরো ইতিহাস জুড়েই শাসকরা এর বদলা নিয়েছেন হিংসাত্মক উপায়ে। বিশ্বের এই অংশে প্রতিরোধের পথ হিসাবে শুধুমাত্র অহিংস পথ ব্যবহার করে সাধারণত স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র অর্জন করা যায়নি। সাম্প্রতিক ইতিহাসে শুধু অহিংস পথ ঔপনিবেশিক শাসকদের ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেছে এটা মোটেই বলা যায় না — ভারতেই বলুন, কিংবা ভিয়েতনাম বা দক্ষিণ আফ্রিকায়।

এ প্রসঙ্গে আমার সাংবাদিক জীবনের একটা নাড়া দেওয়া অভিজ্ঞতার কথা বলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা ড. ইউসুফ দাদু। আমাদের যৌবনকালে, ১৯৫০-৬০ সালে আমরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি সূচক আন্দোলন করছি, সে সময়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে এ নামটি ছিল অতি পরিচিত। দাদু ছিলেন গান্ধীর সাক্ষাৎ শিষ্য, কিন্তু পরে ১৯৬০-এর দশকের শেষাশেষি তিনি সেদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দিল্লীতে রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে একটি ঘরোয়া আলোচনায় আমি দাদুকে সেই প্রশ্নটি করি যেটি সবসময়ে আমার মনে ঘোরাফেরা করছিল। গান্ধীর শিষ্য, অহিংস হয়ে জীবন শুরু করেও তিনি কেন শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ বেছে নিলেন? সে সন্ধ্যার কথা আজও আমার মনে আছে। মনে আছে পুরোনো ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামীর চোখের সেই বিষণ্ণতা ও হতাশার কথা। তাঁর নেতা গান্ধীর পদতলে শেখা পরোক্ষ প্রতিরোধের রণকৌশল নিয়ে বছরে পর বছর হতাশার অভিজ্ঞতার কথা বললেন তিনি। বললেন হিংসাশ্রয়ী রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নিতে বাধ্য হওয়ার কাহিনী।

আজকের ভারতেও এ ধরনের একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন বা ওড়িশার পসকো-বিরোধী আন্দোলন বা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ গরিব মানুষের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন— এ সবের উপর নির্মম পুলিশি দমনপীড়ন চলছে। ছত্তিশগড়ে আদিবাসীদের মধ্যে অনেক দিন ধরে কাজ করে আসছেন যে গান্ধীবাদী হিমাংশু কুমার, তাঁর ওপর নামলো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিহিংসা, তাঁর বনবাসী চেতনা আশ্রম গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। মণিপুরে সাহসী এক নারী ইরম শর্মিলা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীবাদী হাঙ্গার স্ট্রাইকের পথে প্রতিরোধে নেমেছেন, দাবি করেছেন সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট) তুলে নেওয়া হোক। তাঁর ক্ষোভের কথা নিয়ে আলোচনায় বসার বদলে রাষ্ট্র তাঁকে নিয়ে এলো পুলিশের হেফাজতে, কয়েক বছর ধরে তাকে জোর করে খাওয়ানো চলছে। গণতন্ত্রের কথা ছেড়ে দিন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার কি আদৌ সভ্য ব্যাপার? ভারতীয় রাষ্ট্রের এরকম অমানবিক ব্যবহারের পর মণিপুরের যুবকযুবতীরা যদি অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, ভারত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, আমি কি তাদের দোষ দিতে পারব?

অথবা ধরুন কাশ্মীরের কথা। সেখানে এককালের জঙ্গি গোষ্ঠী জেকেএলএফ (জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট) অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে এখন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথে এসেছে। তা সত্ত্বেও তাদের নেতা ইয়াসিন মালিক ও অন্যদের বেশির ভাগ সময় গৃহবন্দী করে রাখা হয়, তাদের কর্মীরা 'বানানো এনকাউন্টারে' নিহত হন। ভারতরাষ্ট্র যদি অস্ত্র ছাড়ার জন্য যদি তাদের এভাবে পুরস্কৃত করে তাহলে, সত্যি বলতে কী, তাদের কর্মীরা এই নিপীড়ক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আবার অস্ত্র হাতে করলে আমি আপত্তি করতে পারি না।

অদ্ভুত ব্যাপার, মাওবাদী ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলে বা কাশ্মীরে রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে ভারত রাষ্ট্রের এইধরনের আগ্রাসী ব্যবহারের বিপরীতে, কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এই ধরনের বিরোধীদের বিরোধিতা করা থেকে নিবৃত্ত থাকে, এমনকি তাদের সহায়তাও করে থাকে, যেমন গুজরাটে। আরও খারাপ ঘটনা ঘটছে মহারাষ্ট্রে। সেখানে কংগ্রেস সরকার (যে কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতার নামে শপথ নেয়) স্থানীয় হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির (যেমন শিবসেনা) বিরুদ্ধে দমনে নামতে ভয় পায়। সেই শক্তি দিনের পর দিন লাইব্রেরির ওপর, শিল্প প্রদর্শনীর ওপর হামলা চালিয়ে যায়, এম এফ হুসেনের মতো বিখ্যাত শিল্পীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ে, অ-মহারাষ্ট্রীয় শ্রমিকদের তাড়া করে ফেরে।

কিন্তু আমি একথা মানি না যে "কেবলমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সামাজিক পরিবর্তন আনা যায়, কারণ গণতান্ত্রিক অহিংস আন্দোলনের এখন আর কোনই স্থান নেই"। এটা একটা বিপজ্জনক তত্ত্ব যা চারু মজুমদারের দৃষ্টিভঙ্গির মতো সংকীর্ণতাবাদী, যে তত্ত্ব অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, গণ আন্দোলন, খোলাখুলি ফ্রন্টের কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতের প্রতিটি কোণই 'অগ্নিগর্ভ' এবং গরিব মানুষের প্রতিটি অংশই হাতে অস্ত্র তুলে নিতে প্রস্তুত, তারা বিপ্লবের জন্য তৈরি। আমরা দেখেছি যে গ্রামের গরিব মানুষের বিপ্লবী সচেতনা সম্পর্কে অবাস্তব উচ্চ ধারণার ফলে ১৯৬৯-৭৫-এ আমরা কীরকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম। ছত্তিশগড়-লালগড়ে যেটুকু অর্জন করা গেছে তাকে বাড়িয়ে দেখে এবং তা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে এই আশায় আমরা যেন সেই ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি না করি। ভারতের গ্রামাঞ্চল, ভারতের কৃষকরা সমবিকশিত নয়। যে ভয়ানক বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হওয়ার কারণে ছত্তিশ গড়ের পিছিয়ে থাকা আদিবাসী অঞ্চলের কৃষকরা মাওবাদীদের অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার ডাকে সাড়া দিয়েছেন, সে রকম অবস্থা অন্য এলাকার গ্রামাঞ্চলে না-ও থাকতে পারে। সব কৃষক অস্ত্র হাতে তুলে নিতে প্রস্তুত নন। ভারতে অনেক এলাকাতেই কৃষকরা চান বর্তমান বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য পঞ্চায়েত ও এই ধরনের গণতান্ত্রিক (অহিংস) পথে চলতে। ওড়িশার মতো (পসকোর বিরুদ্ধে) অনেক জায়গায় বিভিন্ন সংগঠন শিল্প প্রকল্পের জন্য উৎখাত হওয়া ক্ষুব্ধ কৃষকদের গণতান্ত্রিক গণআন্দোলনের পথে সংগঠিত করছেন। এই ধরনের আন্দোলন অনেক সময় রাষ্ট্রকে পিছু হটতে বা কিছু কিছু ছাড় দিতে বাধ্য করে। তার ফলে অনেক সময় একধরনের সামাজিক পরিবর্তন হয়— মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়, সে যত কম সময়ের জন্যই হোক না কেন। সারা ভারতে যেহেতু বিপ্লবী পরিস্থিতি নেই, বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনায় মানুষের বিশ্বাস আছে, আমি তাই মনে করি না যে "সশস্ত্র প্রতিরোধ ও সংগ্রাম ছাড়া উদ্দেশ্য সাধিত হবে না"।

অতীতের সৌন্দর্যতাত্ত্বিকেরা যেমন মনে করতেন শিল্পের জন্যই শিল্প, সেইরকম ধরনের সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যই সশস্ত্র সংগ্রামে আমার বিশ্বাস নেই। বরং উল্টো। আমার এই প্রবন্ধের শেষ দিকে আমি বর্তমান ব্যবস্থায় সম্ভাব্য নানান বিকল্পের কথা বলেছি— এসব বিকল্প ব্যবহারের জায়গা কমে আসছে ঠিকই, কিন্তু একেবারে জায়গা নেই, এমন নয়। অন্যভাবে বললে, ভবিষ্যতের রণনীতিতে বিভিন্ন ধরনের রণকৌশলের স্থান থাকা দরকার, যেগুলি মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতার বিভিন্ন স্তরের উপযুক্ত হবে। অহিংস গণ প্রতিবাদ থেকে শুরু করে কোনও কোনও জায়গায় সশস্ত্র প্রতিরোধ, সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য সিভিল সোসাইটির বুদ্ধিজীবীদের জড়ো করা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের 'ধরনা', ছত্তিশগড়ে হিমাংশু কুমারের মতো নয়া-গান্ধীবাদী গ্রামীণ বিকাশের পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে শুরু করে একই জায়গায় উন্নয়নের মাওবাদী পরীক্ষানিরীক্ষা। শেষ করার আগে আমি বলতে চাই যে, ভারত এক বিশাল ও অসম বিকশিত দেশ। এদেশকে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের শুধু গান্ধীবাদী অহিংস বা শুধু মাওবাদী (সহিংস) কার্যক্রমের মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। হয় এই পথ নইলে ঐ পথ, হয় অহিংস পথ বা সহিংস পথ— এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বদলে দরকার সামাজিক পরিবর্তনের এক সামূহিক দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে আমাদের জনগণের নিজস্ব ইচ্ছা অহিংস ও সহিংস, বিভিন্ন ধরনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।

আমাদের মূল বিষয়ে, অর্থাৎ শক্তিশালী শাসক ও শক্তিহীন শাসিতদের মধ্যেকার অসম দ্বন্দ্বে হিংসা ও অহিংসার প্রসঙ্গে, ফিরে যাই। শক্তিহীনদের উপর রাজত্ব করার জন্য, রাজনৈতিক পরিধিতে ও সিভিল সোসাইটির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য শক্তিধররা যতদিন তাদের সশস্ত্র উপরিকাঠামোর ওপর নির্ভর করা না ছাড়বে, তাদের পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা না নেবে যে এর ফলে হিংসা আরো বৃদ্ধি পায়, ততদিন ক্ষমতাধর আর ক্ষমতাহীনের সম্পর্কে হিংসাই আধিপত্য করবে।

আজকের ভারতে আমরা এই হিংসাত্মক সম্পর্কটিকে কেমন করে পাল্টাতে পারি, তাকে সভ্য ও মানবিক করে তুলতে পারি? অন্যভাবে বললে, আমাদের সমাজের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্বগুলি কীভাবে অহিংস পথে নিরসন করা যায়? এটা প্রধানত নির্ভর করবে ভারতীয় রাষ্ট্রের ও শাসক শ্রেণীর এক বিকল্প নীতিকাঠামো গ্রহণ করার ওপর। পরস্পরবিরোধী অংশের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে একটি জাতীয় বিতর্ক চালানো যেতে পারে। তাতে জনগণের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিকাশের নতুন মডেল গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সম্পদের সম-বন্টনের নীতির মাধ্যমে এধরনের একটি কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে। কিন্তু এসব বিতর্ক ও আলাপ আলোচনা যদি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া হয় তা অবশ্যই জনগণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে। এসব আলাপ আলোচনার পাশাপাশি এমন কিছু কাজ করতে হবে, অধৈর্য্য জনগণ যেগুলিকে মহত্তর এক ভবিষ্যতের জন্য করা ভালো কাজ মনে করতে পারবেন।

যে কাজটা ভারত রাষ্ট্রকে *সবার আগে* করতে হবে তা হলো সারা ভারতের সাধারণ মানুষ যাকে হিংসার প্রধান উৎস বলে জানে সেই সুরক্ষা বাহিনীগুলির স্বেচ্ছাচার ও তাদের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা কমানো। পুলিশ, আধা সামরিক ও সুরক্ষা বাহিনীগুলি (সিআরপিএফ, বিএসএফ, আসাম রাইফেল্‌স, ব্ল্যাক ক্যাট্‌স ইত্যাদি ইত্যাদি) কাশ্মীর ও নাগাল্যান্ডের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের রাজ্যে মানবাধিকার ভঙ্গের জন্যই শুধু নয়, অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারে নকশালদের ও মানবাধিকার কর্মীদের শেষ করার কাজেও আন্তর্জাতিক কুখ্যাতি অর্জন করেছে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভগুলিকেও টুঁটি টিপে মারার জন্য এই সব সুরক্ষাবাহিনীর কুখ্যাত কাজকর্ম চালানো বন্ধ করতে হবে রাষ্ট্রকে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দলগুলি ও সিভিল সোসাইটির গোষ্ঠীগুলি একযোগে কাজ করে গণতান্ত্রিক কাঠামো ফিরিয়ে আনতে হবে, তাকে জোরদার করতে হবে, নতুন কাঠামো তৈরি করতে হবে। এর অর্থ, 'রাজনীতির অপরাধীকরণ' দূর করার গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এই আন্দোলনকে রাষ্ট্রের শক্তিপ্রয়োগের কাঠামোর ওপর, আইন প্রয়োগকারী সংগঠনগুলির ওপর জোর খাটাতে হবে; দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের শক্তিশালী ঘোঁট, অসাধু বাণিজ্য সংগঠন ও অপরাধ-জগৎকে লক্ষ্যবস্তু করতে হবে। এই অপরাধ-জগৎ হলো দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক ও অসাধু ব্যবসায়ীদের হিংসাত্মক হাত, যা তাদের অহিংস দস্তানায় ঢাকা থাকে, আর প্রয়োজন পড়লেই যেটাকে ব্যবহার করা হয়। এই অশুভ আঁতাত ভাঙতে হবে, তা সে কংগ্রেসের ক্ষেত্রেই হোক, কিংবা বিজেপি বা সিপিএম বা অন্য কোনও আঞ্চলিক দলের ক্ষেত্রেই হোক।

শেষ বিচারে তাই এই দারিদ্র্য ও সামাজিক অন্যায়, দুর্নীতি ও অপরাধ দূর করতে ভারত রাষ্ট্রকেই আগে এগিয়ে আসতে হবে। স্বাধীনতার ৬০ বছর পরও ভারতীয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের যথেষ্ট খাদ্য নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ঠিকমতো বাসস্থান বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই— এটা অত্যন্ত লজ্জার। এসবের বিরুদ্ধে আইন থাকা সত্ত্বেও প্রায় প্রতিদিন উচ্চবর্ণের লোকদের হাতে দলিতদের অপমানের শিকার হতে হচ্ছে, প্রাণ দিতে হচ্ছে, পণের জন্য নারীদের শ্বশুরবাড়িতে হত্যা করা হচ্ছে— এ ভয়ানক লজ্জার ব্যাপার।

এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জনগণ যদি প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হিংসাত্মক প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তাঁদের হতাশার কথা ব্যক্ত করেন— এমনকি যেসব এলাকায় মাওবাদীরা নেই সেখানেও, তাতে কি আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে? আমাদের উদারনৈতিক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা, গান্ধীবাদীরা যখন তাঁদের অহিংসার বাণী শোনান, সেটা কি ঠিক? যারা তাঁদের ওপর অত্যাচার করছে তাদের ক্ষমা করে আপস করতে বলার কোনও অধিকার কি এঁদের আছে? প্রায় আশি বছর আগে এই ভারতে এ ধরনেরই হিংসাত্মক বিক্ষোভের এক কালে, এই ধরনের প্রশ্নই তুলেছিলেন অহিংসার পূজারী এক মহান কবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩১ সালে তাঁর রচিত 'প্রশ্ন' কবিতাটি দিয়ে শেষ করি:

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছো বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে',
বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজ দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে
আমি যে দেখেছি— প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা
অমাবস্যার কারা।
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?।